Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

বাংলাদেশে নগরকেন্দ্রিক কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকার : কয়েকটি কেসস্টাডি

মোঃ আল-আমীন হুসাইন[১]*

[১]রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
* Corresponding Author: মোঃ আল-আমীন হুসাইন, ই-মেইল : alamin38gp@gmail.com; মোবাইল: +৮৮০১৮২৩৮২০৪৮০
Received: 20/08/2024; Accepted: 12/09/2024; Online available: 30/09/2024

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক সমাজব্যবস্থার একটি ভয়াবহ সমস্যা হলো কিশোর অপরাধ। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফল হচ্ছে কিশোর অপরাধ, যার বিস্তার শুরু হয় শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে পারিবারিক কাঠামোর ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যা কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ব্যাপকহারে গ্রামীণ জনপদ হতে শহরের দিকে শিশু-কিশোরদের স্থানান্তর এবং বস্তিতে বসবাসের প্রভাবে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ কিশোর অপরাধ প্রবণতার উর্বরক্ষেত্র। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের বহুমুখী সামাজিক সমস্যাগুলোর তালিকায় কিশোর অপরাধ হচ্ছে অন্যতম। প্রতিটি শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের একটি বড় সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক চাপে সেই সম্ভাবনা অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, কিশোর অপরাধ প্রবণতা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। আধুনিক শিল্প সমাজের উপজাত হলো কিশোর অপরাধ। পারিবারিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে কিশোররা এমন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া অপরাধী হয়ে উঠার নানা উপাদান এখন একজন কিশোরের চারপাশে খুবই সহজলভ্য। একজন কিশোর যত সহজে অপরাধমূলক কাজে জড়াতে পারে তত সহজে ভালো কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। পা বাড়ালেই অপরাধ জগতের হাতছানি পাওয়া যায়। দেশের সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং পরিবারের মধ্যে যে অপরাধের বীজ রয়েছে কিশোররা তার বাইরে নয়। কিশোর সম্প্রদায়কে অপরাধ জগতের বাইরে রাখতে হলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবখানে মূল্যবোধ, সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর অপরাধ মোকাবেলার সমস্ত দায়িত্ব পুলিশের কাঁধে চাপিয়ে, অভিভাবকেরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলে এই ব্যাধি থেকে সমাজব্যবস্থা কখনোই মুক্তি পাবে না। এছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপরাধের সাথে যারা জড়িত তারা যদি কোনো প্রভাবশালী অংশের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ঐ প্রভাবশালী অংশকে আড়ালে রেখে কিশোর অপরাধ দমন করতে চাইলে সেটা গাছের গোড়া কেটে ডগায় পানি ঢালার নামান্তর। যে সব কিশোর ইতোমধ্যে অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, দেশে বিদ্যমান আইনানুসারে তাদেরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করে চারিত্রিক সংশোধন করতে হবে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের মানসিক বিকাশ, চারিত্রিক শিক্ষা এবং আত্মিক উন্নয়ন যথাযথভাবে হয় কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য প্রতিকার খুঁজে বের করা এবং এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রদান করা।

মূল শব্দ সূচক : *অপরাধ, কিশোর অপরাধ, কিশোর গ্যাং, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, বস্তি জীবন, অপরাধ জগত, মাদকদ্রব্য*

ভূমিকা

অপরাধী হয়ে কোনো শিশু জন্ম নেয় না। পৃথিবীতে প্রতিটি শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মানবসন্তান অপরাধী হয়ে উঠে। ভালবাসাহীনতা, বিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক অনাচার, শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ, অমানবিকতা প্রভৃতি নানা কারণে শিশুর কোমল মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে আর এ সব কারণে শিশু বিষণ্নতা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার কোমল মনে হতাশা আর ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের স্পৃহা, যার পরিণতিতে শিশু জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। সোনালী শৈশবে সে হয়ে উঠে অপরাধ জগতের বাসিন্দা। অনেক সচ্ছল পরিবারের বাবা-মা ভাবেন, অভাবী বা দরিদ্র পরিবারের সন্তানই কেবল অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, চাহিদা অনুযায়ী না পাওয়াসহ নানা কারণে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই অপরাধী কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। তবে উচ্চবিত্তের সন্তানরাও অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে যাবে না এমনটা ভাবাও ভুল। কিশোর অপরাধীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিত্তশালী পিতামাতার সন্তান। বিশেষ করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের মধ্যে নিম্নবিত্ত পিতামাতার সন্তানদের তুলনায় সমাজের ধনবান ও প্রভাবশালী অংশের বিপথগামী ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই বেশি। রাজধানীসহ সারাদেশে এমন লাখ লাখ শিশু রয়েছে পথেই যাদের

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

জন্ম ও বসবাস। পথে পথে বেড়ে ওঠা এমন শিশুদের 'টোকাই', 'পথকলি', 'ছিন্নমূল' বা 'পথশিশু' বলা হয়ে থাকে। পথে পথে বেড়ে ওঠা এসব কোমলমতি শিশুরা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। দিনে দিনে বেড়ে চলছে এদের সংখ্যা। অপরাধ কী বোঝার আগেই তারা ভয়াবহ অপরাধী হয়ে বেড়ে উঠছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে এসব শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। পথশিশুদের একটি বড় অংশ শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ভাড়ায় কাউকে খুন করা, নাশকতামূলক কাজ করা, ছিনতাই, মাদক বিক্রি, চুরির মতো অপরাধের সঙ্গে অবলীলায় জড়িয়ে যাচ্ছে তারা। বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন থেকেই তারা জড়িত হয়ে পড়ছে নানা অপরাধের সঙ্গে। পথশিশুরা মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়া ছাড়াও তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে মাদকের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের প্রধান মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। পথশিশুদের এসব অধিকারের জায়গা নেই। অথচ একটা শিশুর সবার আগে বাসস্থানের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, খাদ্যের অধিকার রয়েছে, শিক্ষার অধিকার রয়েছে। এসব কিছুই কিন্তু পথশিশুদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এসবের কোনো অধিকারই তারা পাচ্ছে না। পিতামাতাহীন পথশিশুদের ভবঘুরে জীবনযাপন রাস্তা-ঘাটে, রেলওয়ে স্টেশন, ফুটওভার ব্রিজ কিংবা ফ্লাইওভারে। দিনের বেলায় ঘাড়ে বস্তা নিয়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় প্লাস্টিকের বোতল কিংবা লোহা কুড়িয়ে ভাঙারির দোকানে বিক্রি করে পেট চালায়। আর যে টাকা হাতে থাকে তা দিয়ে নানা ধরনের নেশাদ্রব্য কিনে নেশা করে। কেউ কেউ দিনের বেলা নেশা করলেও বেশিরভাগই নেশা করে রাতে। কেউ একা, আবার কেউ কেউ গোল হয়ে বসে সংঘবদ্ধ হয়ে নেশা করে। কিশোর-কিশোরী ও অপ্রাপ্তবয়স্করা চিন্তাভাবনা না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ দ্বারা অতিসহজে ও স্বল্প সময়ে প্রভাবিত হয়। তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে, কৌতূহলবশত বা নিজেকে জনগণের সামনে প্রকাশ করার জন্য অপরাধ করে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ রাষ্ট্র, শহর, গ্রাম বা এলাকাভেদে কিশোর অপরাধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক সমাজে যে কাজ বা আচরণ মূল্যবোধ ও নীতি বিরোধী অন্য সমাজে তা নাও হতে পারে। পরিবার কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন, শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এবং সমাজজীবনে বিরাজমান নৈরাজ্য ও হতাশা কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অপসংস্কৃতির বাঁধ ভাঙা জোয়ারও এজন্য অনেকাংশে দায়ী। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে থাকে অদম্য আশা আর জীবন জগৎ সম্পর্কে থাকে অতিকৌতূহল। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আশাভঙ্গেও বেদনায় হতাশার হাত ধরে নৈরাশ্যের অন্ধকারে পতিত হয় তাদের জীবন। এতে কিশোর বয়সীরা ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধ দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা।
- উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাঁচটি কেসস্টাডি ও তিনটি Key Information Interview (KII) করা হয়েছে।
- পাঠাগার অধ্যায়ন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিশোর অপরাধ বিষয়ক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, পত্রপত্রিকা ও জার্নাল এর সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

অপরাধ

সাধারণত অপরাধ বলতে বোঝায়, এমন কোন সমাজবিরোধী বেআইনী কাজ যা ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ ধরনের কাজ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

অস্ট্রিয়ান মনোবিশ্লেষক Sigmund Freud (1856-1939) বলেন, মানুষের অপরাধ প্রবণতায় লিপ্ত হওয়ার পশ্চাতে ব্যক্তিত্বের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বকে জীবন প্রবৃত্তি ও মরণপ্রবৃত্তির চালিকাশক্তি রূপে গণ্য করেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব তিনটি সত্তা নিয়ে গঠিত। যথা : ইড (Id), ইগো (Ego) এবং সুপার ইগো (Super ego)। যে ব্যক্তির মধ্যে সুপার ইগোর ভূমিকা প্রবল সে ব্যক্তি সহজে অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে ইগো ও সুপার ইগো, ইডের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম সে ব্যক্তি ইড কর্তৃক তাড়িত হয়ে খুব সহজেই অপরাধকর্মে লিপ্ত হবে [১]।

কিশোর অপরাধ

কিশোর অপরাধের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ বেশ কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংগঠিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম পদ্ধতির বরখেলাপমূলক কাজই কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ ধারণাটি একটি জটিল বিষয়। মানব জীবনে কৈশোর কালটি নানা প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার মাঝ দিয়ে পার হয়। স্কুল পর্যন্ত বয়সটাই হলো উড়ু উড়ু চঞ্চল। বাধা না মানার বয়স। এ বয়সে বন্ধু খুঁজতে থাকে সে। পেয়েও যায়। বন্ধুকে ঘিরে যা সত্য না তাও ভাবতে থাকে। কখনও সে মধুর স্বপ্নে আনন্দে

বিভোর থাকে। আবার কখনও বিভিন্ন জটিল সমস্যার কারণে বিষন্নতায় ভোগে। এ ক্লান্তিলগ্নে তার মাঝে এসে ভর করে অস্থিরতা, প্রবৃত্তিগত আবেগময়তা (Romanticism), দুঃসাহসিকতা (Adventurism), ও বীরত্ব (Heroism)। এ সব চিন্তার মাঝে যেমন আছে ভাল লাগা তেমনই আছে নিরব পতনের পদধ্বনি।

অপরাধ ও অপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত ১৯৫০ সালের আগষ্টে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত যে সব আচরণ অসংগতিপূর্ণ বা আইনভঙ্গমূলক অর্থাৎ যা সামাজিকভাবে বাঞ্ছিত বা স্বীকৃত নয় তা সবই কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'আমেরিকান চিল্ড্রেন ব্যুরো' কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রিক আইন বা পৌরবিধি বিরোধী সব কাজই কিশোর অপরাধের আওতাভুক্ত। উপরন্ত, সমাজ সদস্যদের অধিকারে আঘাত করে এবং কিশোরদের নিজের ও সমাজের কল্যাণের পথে হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত এমন যে কোন মারাত্মক সমাজবিরোধী কাজও কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

অপরাধ বিজ্ঞানী বার্ট (Cyril Lodowic Burt) বলেছেন – 'কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী মনে করতে হবে যখন তার অসামাজিক কাজ বা অপরাধ প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে। কিশোর অপরাধী হলো নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে দেশে প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী, যার চরিত্র সংশোধনের কিংবা পুনর্বাসনের জন্য কোনো বিশেষ কর্তৃপক্ষ বা বিচারকের সামনে হাজির করা হয়' [২]। US Department of Justice-এর মতে, 'In the United States, a juvenile delinquent is a person who commits a crime and is under a specific age. Most states specify a juvenile delinquent, or young offender, as an individual under 18 years of age while a few states have set the maximum age slightly different'[৩]. Bertrand Russell (বার্ট্র্যান্ড রাসেল)-এর মতে, 'বেশিরভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন বঞ্চনা এবং নিপীড়নের কারণে, এর ফলে পরবর্তীতে সে কিশোর অপরাধী হয়' [৪]। Karl Marx এর মতে, 'কিশোর অপরাধসহ সকল অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রভাব। অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কিশোর অপরাধের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। দারিদ্র্য ও সম্পদেও প্রাচুর্য উভয়ই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কিশোর অপরাধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে' [৫]। সুতরাং বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ হলো বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক বা সমাজবিরোধী আচরণ, যা আইন কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার নিচের কিশোর-কিশোরী দ্বারা হয়ে থাকে।

কিশোর অপরাধীদের বৈশিষ্ট্য

স্বাভাবিকভাবেই কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েরা কিছুটা অবাধ্য ও ভয়ডরহীন থাকে, তারা বাধা নিষেধের সীমানায় আটকে থাকতে চাই না। কিশোরদের বৈশিষ্ট্য কেমন সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছুটি' গল্পে উল্লেখ করেছেন :

'তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়। সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়'[৬]।

কিশোর অপরাধীদের মাঝে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

- স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ট্য : নিরেট দেহী, সুসংবদ্ধ, পেশীবহুল।
- মানসিক বৈশিষ্ট্য : অস্থির, ধৈর্যহীন, ভাবুকতা।
- কর্মশক্তিগত বৈশিষ্ট্য : মাত্রাহীনতা, আক্রমণাত্মক, নাশকতাপ্রিয়।
- আচরণগত বৈশিষ্ট্য : শত্রুতা, বেপরোয়া, বিঘ্নসৃষ্টিকারী, জেদী, অধিকার বিলাসী, দুঃসাহসিক, সংস্কারবিহীন মন ও আনুগত্যহীন।
- মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : জবরদস্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলাসী, সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাব, স্বার্থপরতা [৭]।

পি ডাব্লু টাপ্পান কিশোর অপরাধীর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

- যার বৃত্তি, আচরণ, পরিবেশ অথবা সংগীতদল তার নিজস্ব কল্যাণের পথে ক্ষতিকর;
- যে অবাধ্য, কিংবা যে তার মাতাপিতা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়;
- ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্কুল পালায় কিংবা সেখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং
- যে রাষ্ট্রিক আইন বা পৌরবিধি বহির্ভূত কাজ করে [৮]।

কিশোর অপরাধ বিষয়ক কেসস্টাডি

রাজধানীর কড়াইল বস্তিসহ মহাখালীর রেলগেইট এলাকা ও কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের বেশকিছু কিশোর-কিশোরীদের উপর কেসস্টাডি করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটি কেস উল্লেখ করা হলো :

কেসস্টাডি-এক

পাঁচ-ছয় বছর আগে রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে পিতৃহীন আকাশ (ছদ্মনাম) তার মা ও ছোট বোনের সাথে থাকতো। বলার অপেক্ষা রাখে না, অভাবের সংসার। আকাশের মা গুলশান-বনানীর কয়েকটি অভিজাত ফ্ল্যাটে ছুটা বুয়ার কাজ করতো। ফেরি করে বাদাম বিক্রির পাশাপাশি আকাশ স্কুলে পড়তো। আকাশ তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। পড়ালেখার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ, কিন্তু বাদাম বিক্রি করার কারণে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারতোনা, পড়ালেখা করবার সময়ও পেতো না ঠিকমতো। ক্রমশ সে বিষন্ন ও হতাশ হয়ে পড়ে। স্বভাবই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বস্তির উঠতি বয়সী ছেলেদের একটি দলে (কিশোর গ্যাং) যোগ দেয় আকাশ। তখন সে ধূমপানে আসক্ত ছিল না। এমনকি যারা ধূমপান করতো তাদেরকে সে পছন্দ করতো না। ঐ দলের ছেলেদের ধূমপান করতে দেখে প্রথমে তার বেশ খারাপ লাগতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নিজেও আসক্ত হয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হলো। এরপরে গাজা, ড্যান্ডি, হিরোইন, ইয়াবা। তখন নেশা ছাড়া সে থাকতেই পারে না। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্যে সে ধীরে ধীরে চুরি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তাদের গ্যাংটা বড় হতে থাকে। বস্তির ভিতরের ছেলেদের সাথে বস্তির বাইরের ছেলেরা এই দলে যোগ দিতে থাকে। তাদের অপরাধ জগতের সীমানাও বাড়তে থ্যাকে। বছর দুই পরে তার মা মারা যায়। এরপরে সংসারের নানা বিষয় চিন্তা করতে করতে কিভাবে যেনো তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। হঠাৎ একদিন রাতে তার দলবলের কাউকে কিছু না জানিয়ে সে মহাখালী রেলগেইটের পাশে আরজোতপাড়া বস্তিতে চলে আসে। নেশা ও অপরাধ জগত থেকে বের হয়ে এসে এখন একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি করে। ছোট বোনকে পড়ালেখা শিখিয়ে অনেক বড় মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন তার। আকাশ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে, এটা খুবই ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। বস্তির যাপিত জীবনে অভাবের তাড়নায় স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে পড়ে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে অপরাধের অন্ধকার জগতে।

কেসস্টাডি-দুই

রানা (ছদ্মনাম), বারো বছর বয়সী একজন কিশোর। চার বছর যাবত কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বাস করে রানা। এটাকে ঠিক 'বাস করে' বলা যায় না। যেখানে বাসস্থান নেই, সেখানে বাস করা যায় কীভাবে! এর আগে সে বাবা-মার সঙ্গে কড়াইল বস্তিতে থাকতো। কিন্তু তার মা মারা যাওয়ার পরে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। তার সৎ মায়ের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হতো এবং রানাকে মারধর করতো। প্রায়শ: বিনা কারণে মারধর করলেও রানার বাবা রানার সৎ মাকে কিছু বলতো না, বরং তার বাবা রানাকে উল্টা বকাবকি ও মারধর করতো। ফলে বাবার অবহেলা ও সৎ মায়ের অনাদর আর অত্যাচারের নাগপাশ ছাড়িয়ে সে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইলো। ফলে পিতামাতার শাসনের জীবন থেকে ছিটকে যায় রানার শৈশব। কড়াইল বস্তির ছেলে রানার নতুন পরিচয় তখন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ছিন্নমূল পথশিশু রানা। রেলওয়ে স্টেশনে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই অন্যান্য পথশিশুর সঙ্গে তার ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সেই থেকেই নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কমলাপুর স্টেশনেই শৈশব পেরিয়ে আজকের কিশোর রানা। এ বয়সটা রানার স্কুলে যাওয়ার বয়স, কাঁধে ব্যাগভর্তি বই-খাতা থাকার কথা। কিন্তু তার কাঁধে ঝুলছে টোকাইয়ের চটের বস্তা। কথা ছিল, এই বয়সে স্কুলে যাওয়ার পথে বাবা-মা তাকে আদর করে কিনে দিবে পছন্দের চকলেট ক্যান্ডি। কিন্তু চরম বাস্তবতা হলো রানার হাতে ক্যান্ডি নয়, ঝুলছে ড্যান্ডি (ড্যানড্রাইট অ্যাডহেসিভ বা ড্যান্ড্রাইট আঠা)। পিতামাতাহীন ভবঘুরে জীবনে প্রতিদিন কুড়িয়ে পাওয়া প্লাস্টিক, লোহা কিংবা পুরনো জিনিস বিক্রি করে পেট চালায় সে। ঘাড়ে চটের বস্তা নিয়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ঘুরে বেড়ায় রানা। সারাদিনের সংগৃহীত ভাঙারি বিক্রি করে যে আয় হয়, তা দিয়ে একবেলা খাবার কিনে খায়, আর বাকি টাকা দিয়ে ড্যান্ডি কিনে নেশা করে। ড্যান্ডির নেশায় সে বুঁদ হয়ে থাকে সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় যেমন, গুলিস্তান, খিলগাঁও, কমলাপুর, মালিবাগ, তেজগাঁও, রামপুরায় সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, শুধু রানা নয়, রানার মতো শতশত শিশু

ড্যান্ডির নেশায় বুঁদ। পথশিশুদের কেউ কেউ দিনের বেলা নেশা করলেও বেশিরভাগই নেশা করে রাতে। কেউ একা, আবার কেউ কেউ গোল হয়ে বসে সংঘবদ্ধ হয়ে নেশা করে। পলিথিন, প্লাস্টিক ছাড়াও নিজের পরিধেয় জামায় ড্যান্ডি গাম লাগিয়ে নেশা করে তারা। কিছুক্ষণ পর পর ঘ্রাণ নিয়ে নেশায় বুদ হয়ে যায় সুবিধাবঞ্চিত এই শিশুরা। নেশার এই নীল ছোঁবলে অন্ধকার পথে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে এরা। নেশার টাকার জন্যে জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে। যে বয়সে শিশুরা মাঠে খেলাধুলা করবে, কিংবা নিজের বাসায় বাবা-মার সঙ্গে শুয়ে গল্প শুনবে, সেই বয়সে ছিন্নমূল শিশুরা ঘুমাচ্ছে পথে পথে। শুয়ে থাকছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিংবা ট্রেনের বগিতে। বস্তি জীবনে অনেক নারী-পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করায় সন্তানদের ওপর অবহেলা, দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট হওয়া, বস্তির জীবনে পতিতাবৃত্তি করে নারীরা সন্তান জন্মে দেওয়ার পর কিছুদিন লালন-পালন করে রাস্তাপথে ছেড়ে দেওয়া, কেউবা সৎ মায়ের জ্বালায় রানার মতো হাজার হাজার শিশুরা সংসার, মা-বাবা-পরিজন ত্যাগ করে ধাপিত হচ্ছে নগরের ফুটপাত, রেলওয়ে স্টেশনের স্বাধীন নেশাময় অপরাধ জগতে।

কেসস্টাডি-তিন

৪ ভাইবোন এবং মা বাবা নিয়ে বিল্লালের (ছদ্মনাম) পরিবার কড়াইল বস্তিতে বাস করে। ভাইবোনের মধ্যে বিল্লাল দ্বিতীয়। তার বাবা গুদারাঘাটে অন্যের নৌকা চালায়। মা গামেন্টস শ্রমিক। বিল্লাল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি ভাতের হোটেলে কাজ করে। বড় ভাই হুমায়ুন টোকাই। ছোট বোন শেফালি চট্টগ্রামে নানার বাড়ি থাকে। ছোট ভাই মিজান কোন কাজ করে না। বিল্লাল ও হুমায়ুন নিয়মিত ড্যান্ডি, সিগারেট ও গাঁজা সেবন করে। বিল্লাল মাত্র এগারো বছর বয়সেই নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। ড্যান্ডি সেবনকে সে নেশা হিসেবে মনে করেনা। সারাদিন কাজ করার পর সব বন্ধুরা মিলে গোল হয়ে বসে মজা করে সেবন করে। বিল্লালের বাবা-মাও জানে যে তাদের ছেলেরা নেশা করে। কিন্তু সেটা নিয়ে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সন্তানদের পড়ালেখা শিখিয়ে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টা তাদের মাথাতেই নেই। চুরি করার কথা স্বীকার না করলেও একাধিকবার চুরির অপবাদে মার খাওয়ার কথা স্বীকার করেছে বিল্লাল। দুইশত টাকার বিনিময়ে সে নিয়মিত রাজনৈতিক মিছিল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। কড়াইল বস্তি থেকে এমন শত শত কিশোর টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। বস্তিতে ও বস্তির বাইরে তাদের নেতা আছে। নেতারা মাঝে মাঝে তাদের খাওয়ায় এবং ইদের সময় নতুন কাপড়চোপড় উপহার দেন। সে বড় হয়ে রাজনীতি করতে আগ্রহী, বিল্লাল মনে করে যারা রাজনীতি করে তাদের অনেক ক্ষমতা এবং নেতারা রাজনীতি করে অনেক টাকা আয় করতে পারে।

কেসস্টাডি-চার

সনেট (ছদ্মনাম) বছর কয়েক আগে নিজ এলাকায় সমবয়সী কিশোরদের নিয়ে একটি কিশোর গ্যাং নিজেই গড়ে তুলেছিলো। না, সনেট কড়াইল বস্তির বখে যাওয়া কোনো কিশোর নয়। বরং বনানীর অভিজাত এলাকার কোনো এক এলিট দম্পত্তির সন্তান সে। শুরুতে মূলতঃ অন্যদের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তারা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়। পরে বেশ বড় একটা গ্যাং তৈরি হয় তাদের। পরে তারা দেখলো, এটা একটা ট্রেন্ড। সবাই গুন্ডামি করছে, গ্যাং বানাচ্ছে, দেয়ালে দেয়ালে স্প্রে দিয়ে গ্যাংয়ের নাম লিখছে। তখন তারাও শুরু করলো। ৫/৬ টা গাড়ি নিয়ে একসঙ্গে মুভ করতো। একসময় বেশ বড় একটা গ্যাং তৈরি হয় তাদের। সনেট তাদের দলপতি। গ্যাং তৈরি হওয়ার পর খুব দ্রুতই অন্য এলাকার গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। অনেক সময় তুচ্ছ কারণেও ঘটতো মারামারির ঘটনা। এক এলাকার ছেলে অন্য এলাকায় গেলে মারধরের ঘটনা ঘটতো। কাউকে গালি দিলে, 'যথাযথ সম্মান' না দেখালে, এমনকি বাঁকা চোখে তাকানোর কারণেও মারামারির ঘটনা ঘটেছে। তখন মেয়েলি বিষয় এবং সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব থেকেও অসংখ্য মারামারি হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে সনেটের গ্যাংয়ে কয়েকটা দামী বিদেশী অস্ত্র যুক্ত হয়। এসব দিয়ে মাঝে মধ্যে ফাঁকা ফায়ারিং করা হতো। অস্ত্রের পাশাপাশি তাদের গ্রুপে ঢুকে পড়ে মরণনাশক মাদক। নিজেদের গ্রুপকে আরো শক্তিশালী ও পুলিশী হয়রানি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করে তার দলের কর্মী হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। ঐ নেতাও নিজের বলয়কে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একসাথে এতগুলো কিশোরকে হাতছাড়া করতে চায়নি, তিনি সনেটসহ তার গ্রুপকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে নেন। ফলে পদধারী ঐ নেতার আড়কাঠিতে পরিণত হয় এই গ্যাংটি। সময়ের ব্যবধানে গ্যাংয়ের কয়েকজনের মধ্যে অর্থলিপ্সা চলে আসে। গ্রুপটাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের ধান্ধা শুরু করতে থাকে অনেকেই। ছিনতাই শুরু হয়, শুরু হয় চাঁদাবাজি। আর মাদকগ্রহণ তখন ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যায়। নানা কারণে নিজেদের মধ্যে অন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়। অন্তদ্বন্দ্বের জের ধরে হয় হত্যাকান্ড। সনেট এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নয় বলে দাবি করে। সে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। এরমধ্যে তার মা-বাবা কৌশলে মামলা মকদ্দমার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলে। এরপরে গ্যাং, গ্রুপ, রাজনীতি সবকিছু ছেড়ে মা-বাবার বাধ্য সন্তান হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে সনেট।

কেসস্টাডি-পাঁচ

শাওনের (ছদ্মনাম) গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা। মা-বাবার সংসারে অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে পাঁচ বছর আগে এক প্রতিবেশীর সাথে ঢাকায় এসে কড়াইল বস্তিতে বসবাস শুরু করে। প্রথমে সে মহাখালী এলাকায় রিক্সা চালাতো। কড়াইল বস্তিতে ইমন (ছদ্মনাম) নামে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় তার। শাওনের তুলনায় ইমন বয়সে বেশ বড় হলেও দু'জনের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ইমনের পেশা ছিনতাই করা ও পকেটমারা। প্রথমে শাওন এই বিষয়টা জানতো না। শাওন যখন ইমনের বিষয়ে জেনে যায় তখন বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ইমন তাকে পকেটমারা শেখায়। এরপর থেকে চলতে থাকে ছিনতাই ও পকেটমারা। বর্তমানে শাওনের বয়স পনেরো। বস্তিতে সে পরিচিত পকেটমার শাওন নামে। বয়সে কিশোর হলেও পকেটমারা ও ছিনতাইয়ের কাজে সে খুবই ভয়ঙ্কর। ইমন ও শাওন মূলত একসাথে পকেট কাটার কাজ করে থাকে। তাদের উপরে একজন ওস্তাদও আছে। এই কাজের জন্য তাদের কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ রয়েছে। বুকপকেটকে বলে বুককান, পাঞ্জাবী বা প্যান্টের ঝুল পকেটকে নিচকান ও প্যান্টের পেছনের পকেটকে বলে থাকে পিচকান। বাস বা জনবহুল স্থানে পকেট কাটার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে টার্গেট করে। এরপর ঐ ব্যক্তির পিছু নেয়। সাধারণত ইমন টার্গেটকৃত ব্যক্তির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর চুলকাতে থাকে। ইমনের হাত নাড়াচাড়ার এক ফাঁকে শাওন ঐ ব্যক্তির পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে যায় তার মূল্যবান জিনিসপত্র। হাত দিয়ে সহজভাবে কাজ সম্পন্ন না হলে সে ক্ষেত্রে ব্লেড ব্যবহার করা হয়। প্রতিপক্ষ তাদের থেকে দুর্বল হলে তখন পকেটমার থেকে তারা ছিনতাইকারীতে পরিণত হয়। তাদের টার্গেট মূলত জনসাধারণের পকেটে থাকা মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ। শাওন গত চার-পাঁচ বছরে বিভিন্ন অপরাধে পুলিশের কাছে কয়েকবার ধরা পড়েছে। কিন্তু পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এবং কিশোর হওয়ার সুবাদে প্রতিবারই সে বেরিয়ে এসেছে।

কেসস্টাডির সার্বিক মূল্যায়ন

এই পাঁচটি কেসস্টাডি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কিশোর অপরাধীদের জীবন বৈচিত্রময় এবং তারা বেশীর ভাগই পথ শিশু ও কিশোর। এসব শিশু কিশোররা অনাদর আর অযত্নে বেড়ে উঠছে সমাজের বোঝা হয়ে। মাদক, চুরি, ছিনতাই, পকেটমারাসহ নানাবিধ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও। কোমলমতি এসব ছেলেমেয়েরা অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক মিছিল মিটিংসহ নানা কাজে। যে সময় হাতে থাকার কথা খাতা-কলম তখন তাদের হাতে থাকছে মরণ নেশা। কিশোররা বুঝে কিংবা না বুঝেই নানা রকম অপকর্ম এবং ঝুকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এসব কিশোরদের পাশাপাশি আশপাশের অন্য কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে অপরাধ। এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তবে কিশোর অপরাধীদের তালিকায় নগরের উচ্চবিত্ত পিতামাতার সন্তানদের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষ করে কিশোর গ্যাংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অভিজাত শ্রেণীর কিশোর। এসব কিশোরদের প্রশয় দিচ্ছে মাদকের গড ফাদার, কতিপয় পুলিশ এবং স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালীরা। তাই নানা অপরাধ করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। তারা বেপরোয়াভাবে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকলেও এসব শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে উদাসীন পরিবার। এসব পথশিশুরা স্কুলে না গিয়ে সময় কাটাচ্ছে শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরি ছিনতাই করে। এরাই একমসয় সমাজের আরও বড় ধরনের হুমকির সৃষ্টি করবে। পরিবারগুলোতে পরিবার পরিকল্পনারও কোন বালাই নেই। এসব পরিবার থেকে যারা জন্ম নিচ্ছে তারা নানা রোগ ব্যাধিসহ সমাজের বোঝা সৃষ্টি করছে। পিতামাতার মধ্যে দাম্পত্য কলহ, ঐক্যমতের অভাব, পরিবারগুলোতে অসচেতনতা, বহু বিবাহ, নৈতিকতার অভাব, দারিদ্র্যতা এবং অশিক্ষার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারগুলোকে সচেতন করা এবং কিশোরদের সুপথে আনা জরুরি। বৈচিত্রময় এসব কিশোরদের বিপথ থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগে অবশ্যই এইসব অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাতে শুধু কিশোর অপরাধীরা নয় পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রেরই মঙ্গল হবে।

কিশোর অপরাধের কারণ

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অধ্যায় হলো কিশোরকাল। এটি এমন এক সময় যখন একজন ব্যক্তি বয়স ও বুদ্ধি উভয় দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে বটে, তবে যথার্থ অর্থে বয়সী তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠে না। প্রাকৃতিকভাবে জীবনের এ সন্ধিক্ষণটি হয় স্বাপ্নিক ও কৌতূহলোদ্দীপক। এ সময়ে সে জানতে চায়, জানাতে চায়। জানতে ও জানাতে গিয়ে যদি বাধাগ্রস্ত হয় বা হোঁচট খায় তাহলে সে মূক ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে, বিভ্রান্তি তাকে অপরাধী করে তোলে, নিয়ে যায় সর্বনাশের অতল গহ্বরে। অন্যদিকে যদি সে অবলীলায় জানতে পারে, জানাতে পারে, উত্তর পায়, মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন পায়, নৈতিক দীক্ষা ও প্রেরণা পায় তাহলে তার অগ্রগতি, অগ্রযাত্রাও হয়ে উঠে অনিবার্যভাবে সুন্দর, শাশ্বত ও সাবলীল।

গবেষণা এলাকায় পরিচালিত কেসস্টাডি, Key Information Interview (KII), পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাতকার ও পাঠাগার অধ্যয়নের মাধ্যমে কিশোর অপরাধের নিম্নোক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত হয়েছে।

কিশোর গ্যাংয়ের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ

বর্তমানে গ্রাম-শহর, কেন্দ্র-প্রান্ত সর্বত্রই কিশোর গ্যাং এক ভয়াবহ আতঙ্কের নাম। গত কয়েক বছর সারা দেশে কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা হু হু করে বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর মহামারির সময় কিশোররা অফুরন্ত অবসর পায়, এই অবসরে তাদের অলস মস্তিষ্কে নানাবিধ উদ্ভট চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খায়। আর এই সব উদ্ভট চিন্তাভাবনা থেকেই প্রধাণত কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিশোরদের এমন বেপরোয়া আচরণ পুরো সমাজব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে। সাধারণত ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেরা কিশোর গ্যাংয়ে নাম লেখায়। তাদের যারা কাছে টানে, তারা বোঝায়, ‘দাপট নিয়ে চলবে, তাহলে সমীহ পাবে, ঝামেলার সমাধান করবে গায়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে।’ ওই বয়সের লক্ষণই হলো, মা-বাবা-ভাইবোনের বাইরে কিছু করে দেখানো, কিছু বন্ধু বানানো, সারাক্ষণ উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ খোঁজা। কেবল ভিডিও গেমের রোমাঞ্চে তাদের মন ভরে না। আত্মবিশ্বাসের টানাপোড়েনও ওই কিশোর বয়সেরই বৈশিষ্ট্য। পরিবারকে যাদের নিরানন্দ মনে হয়, বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ-উত্তেজনায় তারাই ঝোঁকে বেশি।

কিশোরেরা যখন পরিবারে অসন্তুষ্ট বা বঞ্চিত, যখন তাদের মনের চাহিদার দিকে উদাসীন থেকে বাবা-মায়েরা তাদের কেবল ভবিষ্যতের উন্নত উপার্জনকারী হিসেবে গড়ে তোলায় ব্যস্ত, তারা যখন পরিবার বা সমাজ থেকে অনুকরণীয় কিছু না পায়, তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ‘কে আমি? আমার আদর্শ কী? কী আমার লক্ষ্য?’ এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে কিশোর-তরুণরা সুশৃঙ্খল, সুশীল আর সুভদ্র বালক হওয়ার চেয়ে দুষ্ট হিরো হওয়াতেই আনন্দ পায়। সকল ক্ষেত্রে তারা তখন সু উপসর্গের পরিবর্তে কু উপসর্গ দ্বারা তাড়িত হয়। কেননা, আমাদের সমাজে মন্দ বীরদেরই সংবর্ধনা দেওয়া হয়, এখানে সুজন অপেক্ষা কুজনের কদর বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই বড় নেতা, প্রশাসক, ব্যবসায়ী কিংবা যশস্বী ব্যক্তি হন। গ্যাংয়ের সদস্য হওয়া এভাবে হয়ে ওঠে এক কাঙ্ক্ষিত পরিচয়। আমি কে; কী আমার লক্ষ্য; আমার আদর্শ কী; এই কিশোরসুলভ প্রশ্নের এটাই তার বিকল্প জবাব। কারণ, এই জবাবটাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সুলভ। সমাজ নবীনদের সামনে যে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য দেয়, সেটা পূরণের পথে বাধা ও বৈষম্য দেয় তার চেয়েও বেশি। গ্যাংবাজি সন্ত্রাস সেসব বাধা ডিঙিয়ে সুযোগের অভাব কাটিয়ে বন্ধু, বিলাস ও বলশালী মর্যাদা উপভোগের রাস্তা খুলে দেয়। যখন সমাজ নেই, তখন রাস্তার গ্যাং তার বিকল্প সমাজ। মারপিট তার জমাট হতাশা নিষ্কাশনের সরু নালা।

মূলত ২০১৭ সালে উত্তরায় আদনান হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কিশোর গ্যাংয়ের সহিংসতার নির্মমতা জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়। ৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ১৭ নম্বর সড়কের উপর আদনান কবিরকে (১৪) সংঘবদ্ধ গ্যাং মারাত্মকভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। তখন তিনটি গ্যাংয়ের (ডিসকো বয়েস, বিগবস্ ও নাইনস্টার) মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আদনানকে ধারালো অস্ত্র ও হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে আদনানের মৃত্যু হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে র‍্যাব-১, উত্তরা, ঢাকার একটি আভিযানিক দল উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ১৭ নম্বর সড়ক এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করে চাঞ্চল্যকর আদনান হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি এবং ডিসকো বয়েস গ্যাং গ্রুপের দলনেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে মূল আসামি তালাচাবি রাজুকেও র‍্যাব গ্রেফতার করেছিল। র‍্যাবের হাতে এ সময় একের পর পর গ্যাং ধরা পড়েছিল এবং তাদের ধরতে মাঝে মাঝে অভিযান পরিচালনা করেছিল র‍্যাব। ২০১৭ সাল থেকে অদ্যবধি র‍্যাব ২৭২ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। শুধু হত্যাকাণ্ডের পৃথক চারটি ঘটনায় মোট ২০ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। এরপর র‍্যাব ২০১৯ সালে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক সেবন, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের সংশোধনাগারে প্রেরণ করেছিল, যা সে সময় দেশে আলোচনার শীর্ষে ছিল [৯]।

রাজধানীতে এখন অন্তত ৭০ থেকে ৭৫টি কিশোর গ্যাং সক্রিয় রয়েছে। এদের সদস্য সংখ্যা দেড় থেকে দুই হাজার। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় সমগ্র দেশের চিত্র কতটা ভয়াবহ। রাজধানীর উত্তরা, মোহাম্মদপুর, বৃহত্তর মিরপুর, পুরান ঢাকার লালবাগ ও হাজারীবাগ এলাকায়ই মূলত কিশোর গ্যাং ছড়ানো-ছিটানো। বাংলাদেশে তিনটা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকা কিশোরদের ২০ শতাংশ হত্যা এবং ২৪ শতাংশ নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি। ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে ৮২১টি মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা ১ হাজার ১৯১। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার উত্তরায় ‘অপু ভাই’ নামে খ্যাত টিকটক ভিডিও নির্মাতা একটি রাস্তা অবরোধ করে ৭০-৮০ জন মিলে টিকটক ভিডিও তৈরি করছিল। সে সময় রবিন নামে একজন প্রকৌশলী গাড়ি নিয়ে রাস্তা পার হতে গেলে অপুসহ তার দল মিলে মারধর করে ওই ব্যক্তির মাথা ফাটিয়ে দেয় [১০]।

অতীতে কিশোর গ্যাং বলতে কিশোরদের কাছে পরিচিত ছিল, ‘আমার বন্ধু রাশেদ’, ‘দীপু নাম্বার টু’, ‘তিন গোয়েন্দা’ মাসুদ রানা, দস্যু বনহুর কিংবা হুমায়ূন আহমেদের বাকের ভাইয়ের মতো নৈতিক বীরেরাসহ বিভিন্ন গ্রন্থের জনপ্রিয় চরিত্র। এসব কিশোর

গ্যাং সমাজের নানা অন্যায় ও অসংগতি রুখে দিতে কিশোরদের অনুপ্রাণিত করতো। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামক দুঃসাহসী এক তরুণ দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। পক্ষান্তরে, কিশোর গ্যাং এখন মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, মাদক চোরাচালান, অপহরণ, যৌন হয়রানি, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি থেকে শুরু করে গুম-খুনের মতো ঘৃণ্য অপরাধে কিশোরেরা জড়িয়ে যাচ্ছে প্রায়শই। বর্তমানে কিশোর গ্যাং শুধু অভিভাবকদের জন্যই আতঙ্ক নয়; বরং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কিশোর অপরাধ বিস্তারের রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশে দিন দিন কিশোর অপরাধ বেড়েই চলছে। রাজনৈতিক দলের বড় ভাইদের মদদে তারা গড়ে তুলছে শক্তিশালী অন্তর্জাল। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় বছরের পর বছর এসব অপরাধের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে এই অন্তর্জালের সদস্যরা। নিজেদের বড় ও প্রভাবশালী বলে উপস্থাপন করতে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো, বাইক রাইডিং, অনলাইন ক্যাম্পিং, দেয়াল লিখনের মাধ্যমে গ্যাংগুলো গড়ে উঠছে। মেয়েদের উত্যক্ত করা, দল বেঁধে মাদক সেবন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, এমনকি মাদক কারবারেও জড়িয়ে পড়ছে এসব গ্রুপ। প্রতিটি দলে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে অন্তত ৮-১০ জন করে থাকছে। তবে দলনেতার বয়স তাদের চেয়ে বেশি, ১৮ থেকে ৩০ বছর। স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে অপরাধ করতে মহল্লার বড় ভাই এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা এসব দলনেতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাদের হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে এবং দখল ও চাঁদাবাজিতে দল ভারী করেছে উঠতি বয়সী এই অপরাধীরা। মাদক কারবার ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার পাশাপাশি এলাকায় রাজনৈতিক দলের আধিপত্য বিস্তার করতেও কাজ করে এই কিশোর সদস্যরা। দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে এই আশায় স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের মাঝেমধ্যেই কাছে টানেন। বস্তির দিনমজুর থেকে শুরু করে ধনীর দুলালরা এই চোরাবালিতে নিজের অজান্তেই পা দিচ্ছে। যে কারণে তাদের অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রায়েরবাজার বেড়িবাঁধ এলাকায় ২০১৮ সালের ২৮ আগস্ট স্টার বন্ড নামের একটি গ্যাংয়ের সদস্য আমিনুল ইসলাম নিহত হয় প্রতিপক্ষ মোল্লা রাব্বি গ্রুপের হাতে। একই রকম পোশাক ও চুলের স্টাইল করে এলাকায় ওই দল দু'টির সদস্যরা এখনো সক্রিয়। স্টার বন্ডের প্রধান মুন্না ও মোল্লা রাব্বি গ্রুপের প্রধান রাব্বি বয়সে তরুণ হলেও তাদের দলে আছে কম বয়সী কিশোররা। এই কিশোর গ্যাংয়ের নেতৃত্বে রয়েছে কিছু রাজনৈতিক দলের বড় ভাইদের মদদ। তারা কিশোরদের বিপথগামী করে গড়ে তুলছে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। এলাকার মুরুব্বিদের অসম্মান করা ও নারীদের উত্যক্ত করা, হরহামেশা অস্ত্র প্রদর্শন ও বড় ধরনের শোডাউন দিয়ে এলাকার লোকজনের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়ানোই হচ্ছে এই সিন্ডিকেট চক্রের প্রধান কাজ [১১]।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

- বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব খুব প্রকট হয়ে উঠে। এ সংকটের অন্যতম কারণ অপরিণত আবেগের বৃদ্ধি। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায়, অপরিণত মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি মানে সুস্থ আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটতে না দেওয়া। সহনশীলতা ব্যাপারটা সৃষ্টি হয় আবেগ থেকে। সেই স্বতস্ফূর্ত আবেগে যদি বাধা আসে, তাহলে সহনশীলতার অভাব ঘটতে বাধ্য। এই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ই কৈশোরের অনেক বিতন্ডার মূল।
- শিশু-কিশোরদের আমরা অনেক কিছুই ঠিকমতো শেখাই না। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা সেভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারে না। জীবনে অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না। এ না পাওয়া ব্যাপারটা যে জীবনেরই অঙ্গ, আমরা তা শেখাই না। এমনিতেই বয়ঃসন্ধির সময় হরমোন এবং শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংকট দেখা যায়, এ সঙ্কট এতটাই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, তখন কোনও ব্যর্থতা দেখা দিলে তারা তা সহ্য করতে পারে না। সহ্য না করতে পেরে তারা ভেতরে ভেতরে নানাভাবে অপরাধী হয়ে উঠে। আবার কেউ কেউ এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে তারা আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে পারে। এটি যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে ঘটে থাকে, তেমনটা ঘটে থাকে প্রেম বা অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও।
- কোনো কোনো ছেলেমেয়ে এ বয়সে আবেগপূর্ণ মিথ্যাবাদী (Pathological lier) হয়ে যায়। তারা মিথ্যের মধ্যেই থাকতে শুরু করে। মিথ্যে আর সত্যের মাঝে ভেদরেখাটা তাদের সামনে ক্রমশ মুছে যায়। অবাস্তব বা রোমান্টিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তারা। মাতা-পিতার সঙ্গে যত বেশি মানসিক বিভেদ, বাড়িতে যত অশান্তি বাড়তে থাকে, ততই এ মিথ্যাচারও বাড়তে থাকে। পলাতকী মনোভাব (Escapism) থেকে এ মিথ্যা বিশ্বাস, মিথ্যা কথার ব্যাপারটা আসে। বয়ঃসন্ধিতে ছেলেমেয়েরা একটু বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। মাতা-পিতার মধ্যে কোনো রকম দুশ্চিন্তা থাকলে, নিঃসঙ্গ বা অবহেলাবোধ করলে ছেলেমেয়েরা খুব বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। অসম্ভব জেদি, রাগী, একগুয়ে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে এমন একটা পর্যায়ে তারা ক্রমশ চলে যায় যে, শেষ পর্যন্ত জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে। সবরকম আনন্দ, স্পৃহা, উৎসাহ থেকে দূরে চলে যায় , খাবার খেতে চায় না, ক্ষুধা পায় না

এবং এদের সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বয়ঃসন্ধির এ মানসিক রোগকে বলে, নার্ভাস ক্ষুধাহীনতা (Anorexia nervosa)। যারা এতদূর যায় না তাদের অনেকেই বিষন্নতায় (Depression) ভোগে [১২]।

- একটি কিশোরের ভেতরে Input-output খুব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের হাবভাবও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, যদি সে পরীক্ষায় ভাল ফল করে, তাহলে মা তাকে ভালবাসবে। এ মানসিকতার ফলে মা-শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসার ঘাটতি দেখা যায়। ভালবাসা ব্যাপারটা শর্তসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা শুরু হয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার চাপ থেকে এই Input-output-এর চাপ তৈরি। তখন থেকেই দূরে সরে যায় সহজ সরল জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনা।
- অতি অল্পবয়স থেকেই কিশোরকে একটা যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে বেঁধে ফেলার চেষ্টা চলে। সে যেনো কোন এক উপকরণ বা কাঁচামাল। ওই যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে তাকে ক্রমশ বড় করে তোলা হয়। সে যখন বন্ধুদের সাথে খেলছে, তখন হয়তো তাকে টেনে হিঁচড়ে অঙ্ক কষানোর জন্য টিচারের কাছে বসিয়ে দেওয়া হল। পড়ানো শেষ না তখনই আবার দৌড়। এরপর নাচগানের ক্লাস আছে। ড্রইং শেখা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, এসব যান্ত্রিকতা তাদের ভাল লাগে না। এ ধরনের যান্ত্রিতায় তারা মরিয়া হয়ে পড়ে। ফলে পড়াশুনাটা স্বাভাবিক ভাবে হয় না, পুরোটাই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। 'নাও এবার এটা মুখস্থ কর' এ মনোভাবে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এমন কি বাড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে স্কুলে গেলে সেখানেও একই দৃশ্য, একই পদ্ধতি। সেখানেও রয়েছে সেই যান্ত্রিকতা।
- কিশোররা অনেক কিছু আঁচ করে নিতে পারে। তারা বুঝতে পারে বাবা মায়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ত্রমাগত ভাবনা চিন্তা করছেন। বাবা মায়ের উদ্বেগ তাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিশোরদের মনেও তৈরী হয় অপরাধবোধ। বাবা মায়েদের কৃত্রিম ব্যবহারও কিশোরারা বেশ বুঝতে পারে। সারাদিনের ধকল সামলে বাবা মায়েরা নিতান্ত অনীহা সত্ত্বেও যখন হাসিমুখে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেন, তখন কারা বুঝতে পারে বাবা কিংবা মায়েরা ক্লান্তি, বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে উৎসাহের ভান করছেন। তাদের সংবেদনশীল মন এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং ক্রমশ বাবা মায়েদের মেকি ব্যবহারে দু'পক্ষের মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়ে যায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে। ফলে পরীক্ষায় খারাপ ফল বা প্রেমে ব্যর্থ হলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে না। এবং নিজের জন্যে ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।
- অভিভাবকেরা সব সময়ই চান তাদের চাহিদামতো সন্তানটি বেড়ে উঠবে। অর্থাৎ, তার কোনও স্বকীয়তা থাকার দরকার নেই, তারা যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমনটি তাকে হতে হবে। একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই।
- একসময় বাবা-মায়ের ভালবাসা ছিল শর্তহীন। 'আমার সন্তান, সুতরাং চাওয়া-পাওয়ার হিসেব না করে হৃদয়ের নিষ্কলুষ ভালবাসা দিয়ে যাব' এমন মনোভাব কাজ করতো। মা-বাবা মানেই সকল দুঃখের অবসান, অফুরান ভালবাসা, এ শ্বাশত ধারণা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আজকাল বাবা-মায়েরা নিজস্ব জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে বাবা-মায়ের ভূমিকা এখন মিশ্র। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এমন ভূমিকার ফলেও কিশোররা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

স্বাস্থ্যগত কারণ

কিশোর অপরাধের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া স্বাস্থ্যগত কারণও দায়ী হতে পারে। মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণের মতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর কারণে একটি কিশোরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কাজ করতে পারে।

বার্থট্রমাঃ জন্মের সময় কোন আঘাত পেলে। এটি হতে পারে নীচের কারণগুলোর জন্য :

- ফরসেপ ডেলিভারী : এটি এমন একটি প্রসব সহায়ক পদ্ধতি যেখানে, ডাক্তাররা যোনির ভেতরে একটি বড় চামচের মতো ফরসেপ প্রবেশ করান, তাকে শিশুর মাথার চারপাশে ধরেন, এবং আস্তে আস্তে শিশুটিকে বের করে আনেন। যদিও, এটি আর পছন্দসই সহায়ক প্রসব পদ্ধতি নয়। ডাক্তাররা সাধারণত সিজারিয়ান পদ্ধতি অনুসরণ করেন।
- অবস্ট্রাকটেড লেবার : যথাযথ লেবার পেইন ওঠার পরও বাচ্চা ডেলিভারি না হওয়াকে অবস্ট্রাকটেড লেবার বলে। এরফলে ডেলিভারি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। একারণে বাচ্চা আঘাত পেতে পারে, বাচ্চা মারা যেতে পারে, মায়ের জরায়ু ফেটে যেতে পারে, মা মারা যেতে পারে।
- স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি : এটার অর্থ হলো মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়া বা গাঠনিক ক্ষতি, যার ফলে গতিশীলতা বা অনুভূতি কমে যায় এবং পাশাপাশি স্বাভাবিক কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটে।

- প্রসবের সময় অত্যধিক রক্তপাতের ফলে।
- মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন সিনড্রোম : বাচ্চার জন্মের আগে বা পরে ডানদিকে ফুসফুসের মধ্যে মেক্কিয়ানা এবং অ্যামনিয়োটিক তরল মিশ্রণের শ্বাস ফেলতে পারে। এটি মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন বা আইকনিয়াস অ্যাসপিরেশন সিনড্রোম (এমএএস) নামে পরিচিত। যদিও এমএএস প্রায়ই জীবনধারণ করে না, তবে এটি নবজাতকের জন্য স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণ হতে পারে। এবং, যদি এমএএস গুরুতর হয় তবে এটি মারাত্মক হতে পারে।
- ফিট্যাল ডিসট্রেস বা ভ্রূণের মর্মপীড়ার ফলে [১৩]।

মায়ের অসুস্থতার কারণেও এটি হতে পারে। যেমন :

- নেশাগ্রস্থ হলে অথবা মদ, গাঁজা, অত্যধিক ঘুমের ওষুধ সেবন করলে
- উন্মাদগ্রস্ত বা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে

এছাড়া জেনিটিক ইনহেরিটেল-এর কারণে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হতে পারে :

- ক্লোমাজমাল ডিজিস।
- এক্স, ওয়াই, ওয়াই, ক্রোমোজমের শিশু-কিশোররা
- বর্ডার লাইন পারসোন্যালিটি থাকলে সামান্য কারণে উত্তেজিত ও বদমেজাজী হতে পারে
- শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী (বাতিকগ্রস্ত মন, দুর্বল দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, বিকলাঙ্গতা ইত্যাদি) হলে [১৩]।

কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে মাতা-পিতা

বর্তমান দেখা যায় যে, মা-বাবা উভয়ে ঘরের বাইরে কাজ করছেন। ফলে সন্তান-সন্ততি তাদের উপযুক্ত স্নেহ, শাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আচরণে বিদ্রোহধর্মী হয়ে যাচ্ছে। এমনটিও দেখা যায় যে, মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কোন কোন কিশোর মা অথবা বাবাকে হারাচ্ছে। এ কারণেও কিশোরদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমস্যা দেখা দেয় এবং তারা অসংলগ্ন আচরণ তথা সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। অধিকন্তু পারিবারিক পরিমন্ডলে কোন শিশু-কিশোর যদি সর্বদা ঝগড়া বিবাদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অপরাধমূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তাদের পক্ষে সহসা কিশোর অপরাধী হয়ে উঠা অসম্ভব নয়।

মাতাপিতার কিছু কর্মকান্ডের ফলে সন্তানগণ কিশোর অপরাধী হতে পারে, যেমন :

- সংসারত্যাগী বা পলাতক মাতাপিতা : এরা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। সন্তান এদের অপত্য স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
- অপরাধী মাতাপিতা : এরা সন্তাকে পাপের মধ্যে রেখে বড় করেন। কখনো বা সন্তানের সহায়তায় পাপ করেন।
- অপকর্মে সহায়ক মাতাপিতা : এরা সন্তানের অপরাধস্পৃহায় উৎসাহ দেন।
- অসচ্চরিত্র মাতাপিতা : তারা নির্বিচারে সন্তানের সামনেই নানা অসামাজিক কাজ করেন ও কথা বলেন।
- অযোগ্য মাতাপিতা : এরা সন্তানকে প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা দানে অমনোযোগী বা অপারগ [১৪]।

ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট

মা বললেন 'হ্যাঁ' কিন্তু বাবা বললেন 'না', একজন কিশোরের এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়াকে মনোচিকিৎসকরা বলেন, 'ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট'। কিশোররা এই দ্বন্দ্বের আবদ্ধে আটকে পড়ে। তারা বুঝতে পারে না আসলে কোনটা সত্য বা মিথ্যা। কারণ একই অবস্থায় দুটোই সত্য বা মিথ্যে হতে পারে না। তাই সে মানসিক বিপর্যয়ে পড়ে এবং এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত **১২** থেকে **১৬** বছর বয়সী কিশোরদের এমন অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়। কেননা এ বয়সী কিশোররা চট করে মুখের ওপর না বলতে পারে না। ওরা নীরবে নিজেদের কষ্ট দিতেই ভালোবাসে। তখন তাদের মাঝে এক ধরনের দুঃখ বিলাসিতাও কাজ করে। মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কথা ব্যথার-অপমানের-অসন্তোষের হলেও অপারগতা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে চলে। সাধারণত কিশোর অপেক্ষা কিশোরীরাই এ অবস্থার শিকার হয় বেশি। মেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি সেই মেয়েকে শিখিয়ে

দেয় যে, সে বড় হয়েছে। কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক বৃদ্ধিও প্রয়োজন। আর এর অভাব থাকলে সেই মেয়ে চিন্তা করে যে, সে তেমন একটি বড় হয়নি। তাই তারা মা-বাবার অনুশাসনমূলক বাধা-বিপত্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়ে। এতে সে দারুণ বিষণ্নতায় ভোগে। নিজেকে জগৎ থেকে আলাদা মনে করতে থাকে। এক পর্যায়ে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে বসে এবং তাতে সফল হয় অনেকে। মা-বাবার দু'জনের দু'রকম বাক্য ব্যয়ে সন্তান আক্রান্ত হয়ে থাকে। যদি 'না' বলতে হয় তবে ভালোভাবে যুক্তিসহকারে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যদি হ্যাঁ করেন তাহলেও তাই। মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের মতে, এমন পরিস্থিতিতে পড়লে কিশোররা অবসাদ, মাদকাসক্তি, ভগ্নমনষ্কতাসহ (Schizophrenia) বহু মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। মূলত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেই এমনটি হয় [১৪]। তাই কিশোর-কিশোরীদের মনকে বুঝতে হবে। সব সময় না-না বাক্য কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। ওদের মনকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না। ওদের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিতে হবে। কখনো যেন মানসিক বিপর্যয় না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা জরুরি। ছেলেমেয়ে বিভেদ-বৈষম্য করা ঠিক না। যা কিছু নিষিদ্ধ তা দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে হবে।

কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে শিশুশ্রম

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ সারাবিশ্বেই। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তা সত্ত্বেও এদেশে সর্বত্রই শিশুশ্রম আছে। বিদেশীদের হস্তক্ষেপে গার্মেন্টস কারখানায় শিশুরা এখন আর কাজ করে না, তবুও এক্ষেত্রে জন্মসনদে বয়স নয়-ছয় করে অগণিত শিশু কিশোর গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করছে। তাছাড়া যাত্রীবাহী বাসে, লেগুনায়, কিংবা ট্রাকে এরা কাজ করছে। বাসে যে শিশুরা কাজ করে এদের অধিকাংশের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। যে বয়সে মা-বাবার আদরে আহলাদে এদের স্কুলে যাওয়ার কথা, বিকেলে সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা, সে বয়সে এরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করছে। মাঝে মাঝে ছোট বাসের ভেতরে অথবা হ্যান্ডল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে। অন্য দিকে যাত্রীদের দুর্ব্যবহার তো এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দরিদ্র মাতা-পিতার ঘরে জন্ম নেয়াই এদের অপরাধ। একটু আদর, একটু ভালোবাসার কাঙাল এ শিশুরা সময়ের ব্যবধানে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। আর এই মাদকাসক্ত থেকেই এই কোমলমতি শিশু কিশোররা নানাবিধ অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা [১৫]। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান আছে অনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৩৩। কিন্তু সংবিধান, আইন সব কিছুই নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অদ্যাবধি অসমর্থ। এমতাবস্থায়, জঠর যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো কিশোরকিশোরী বাধ্য হয়ে দুষ্কর্মে বা পাপাচারে লিপ্ত হয়।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে আবেগ ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কিশোর অপরাধীরা পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে তা অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য সবার আগে দরকার গ্রাম কিংবা শহর, পাড়া কিংবা মহল্লায় সর্বত্র ভালো পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষিত সজ্জন ও অভিভাবক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াস। অধ্যয়ন, সৃজনশীলতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি। পরিবার, সমাজ ও স্কুলের পরিবেশ হওয়া দরকার আনন্দময় ও প্রণোদনাপূর্ণ।

কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির মূলোৎপাটন

বাংলাদেশে বর্তমানে কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির যে পরিস্থিতি, এবং সমাজ ও অভিভাবকদের যে নির্লিপ্ত ভূমিকা তাতে এই বিষফোঁড়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দূরূহ, বলতে গেলে অসম্ভব। বাংলাদেশে অপরাধ ও সহিংসতার যে সামাজিক জলবায়ু ছিল, কিশোর গ্যাংগুলো তারই অশান্ত বর্ণালি। এটা একটা প্রজন্মগত সমস্যা। এর সঙ্গে জড়িত মাফিয়া রাজনীতি, মাদক, অস্ত্র, সন্ত্রাস এবং ব্যাটাগিরি সংস্কৃতি। কিন্তু বাকি সব বাদ দিয়ে তাদের 'তুই অপরাধীরে' বলে দাগিয়ে দেওয়ায় কেবল পুলিশি সমাধানেরই ঝোঁক বেড়েছে। অভিভাবকেরাও মনে করেছেন কিছুটা শাস্তি ও পুলিশি শাসন তাদের সন্তানদের বখে যাওয়া থেকে বাঁচাবে। কিন্তু সমস্যাটার জন্ম যখন পারিবারিক আবহে তথা সমাজে, তখন সমাজতাত্ত্বিক সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধান অসম্ভব। শুধুমাত্র পুলিশের হাতে ক্ষমতা দিয়ে অভিভাবকেরা নিজেদের ব্যর্থতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে, পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করতে ঠিকই কিন্তু কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির যে অব্যাহত বাঁধভাঙা স্রোত, সে স্রোত এই শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে পতিত করবে। সেজন্য কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি থেকে এই ঘুনে ধরা প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে পুলিশের চাইতে অভিভাবকদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক সমস্যা। আমরা যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যায়, বাংলাদেশে এ অপরাধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় অভিভাবকরা সন্তানদের অবাধ্যতার কারণে প্রায়ই আদালতের দ্বারস্থ হতেন। সে সময় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে এ অবস্থা ছিল না, তখন কোনো কিশোর আদালত ছিল না। ১৯৭৮ সালে ২০০ কিশোর অপরাধী রাখার উপযোগী কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান টঙ্গীতে স্থাপন করা হয়। এ অপরাধীদের বেশির ভাগই ছিল অভিভাবকদের অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু বর্তমানে এ চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন ১০ ভাগ অভিযোগ আসছে অভিভাবকদের তরফে এবং বাকি ৯০ ভাগ অভিযোগই পুলিশের। কিশোর বয়সসীমা আইনত ১৬ বছরের নিচে ধরা হয়। কিন্তু বয়স ১৬ বছরের নিচে হলেও তাদের মানসিক বিকাশ বয়সসীমা অতিক্রম করেছে। ফলে সম্প্রতি তারা চুরি, ডাকাতি, খুন রাহাজানিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, সেখানে সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ থাকছে না মা-বাবার। বর্তমানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে। তারাও নানা অপকর্মে জড়িত। তবে তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ কেসের তুলনায় অভিভাবকের কেসের সংখ্যা হয়তো বেশি। তাদের অপরাধের ধরণটাও আলাদা। বয়োসন্ধিকালেই কিশোর অপরাধের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতির যুগে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে। যেসব জিনিস জানার প্রয়োজন নেই, সেসব বিষয় জানার সুযোগ পাচ্ছে তারা। তাতে বিভিন্ন ধরণের অপকর্মে আসক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়তই। ফলে নানা মাদকাসক্তি, সেক্স অফেন্স এমনকি খুনের মতো কাজেও তারা প্রলুব্ধ হচ্ছে। এসব কাজ করার পেছনে যে স্পৃহা কাজ করে সেটা অনেকটা থ্রিল বা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী, স্থানান্তরিত হয়ে যারা শহরে বাস করে তাদের অধিকাংশই লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রে অল্প বয়সে কর্মে নিয়োজিত এবং তারা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায়নি। তাদের ক্ষেত্রেও অপরাধের প্রবণতা প্রবল রূপ ধারণ করছে। অন্যদিকে তাদের দৈহিক ও সামাজিক বিকাশ যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে তাদের চাহিদাও অভিভাবকরা ঠিকমতো পূরণ করতে পারে না। ফলে তারা নিজেদের অসহায় মনে করে এবং সমাজও তাদের সেভাবে গ্রহণ করে না। এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। রাস্তাঘাট, ফুটপাত, পার্ক, খোলা জায়গা বা বস্তিতে বাস করে তারা। এ শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকার। তাদের জন্য কর্মসংস্থান প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুবই জরুরি।

পরিবারের দায়িত্ব

শিশু-কিশোরদের কাদামাটির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। শিল্পী কাদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান, সে রূপেই গড়ে তুলতে পারেন। বস্তুত, শিশু-কিশোররা কাদামটির মতোই কোমল। পরিবার ও সমাজ জীবনের পরিপার্শ্বের মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে। সভ্যতার প্রথম সোপানই হলে পরিবার সংগঠন। দয়া, মায়া, প্রেম-ভালোবাসা অপরের প্রতি সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলোর বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষালয় হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বলা যায়, মানব জীবনের প্রধান বুনিয়াদ। তাই সুষ্ঠুভাবে শিশু-কিশোরের ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে একটি সুসংহত পরিবার এবং পারিবারিক দায়িত্ব অপরিসীম। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নৈতিক শিক্ষার ভিত এখানেই রচিত হয় যা আজীবন টেকসই হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায় :

- শিশু-কিশোরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং সীমার বাইরের কাজ করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে, এ বোধ তৈরি হয়।
- শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে। স্বাভাবিক উচিত, অনুচিত, ভালোমন্দের সাধারণ প্রভেদ তাকে বুঝতে দিতে হবে।
- মাতা-পিতাকে প্রত্যেক শিশু-কিশোররের আস্থাভাজন হতে হবে। সন্তনেরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার মানসিকতা অর্জন করতে পারে তার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে।
- কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত এসব সম্পর্কে তাকে অবহিত করা প্রয়োজন।
- একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে কিশোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন এবং অপরিহার্য না হলে তাদের কোনো কাজের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত।
- কিশোররা যেন অনুভব করে যে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার অসীম ভালোবাসা ও গভীর দরদ রয়েছে এবং এ ভালোবাসায় ছেলেমেয়ে উভয়ের প্রতি আছে তাদের মাতাপিতার সমতা নীতি।
- কিশোরদের প্রতিটি সুন্দর ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রশংসা করতে হবে। তাদেরকে উৎসাহ দেয়া দরকার,

তবেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। মাতা-পিতার বলা উচিত, 'আমি জানি এটা তুমি করতে পারবে', 'জানতাম, তুমি পারবে' ইত্যাদি। কোনো সাফল্যই অভিনন্দন জানানোর জন্য ক্ষুদ্র নয়। কখনো কাজে সফল না হলে সমালোচনা করতে হবে, তবে প্রশংসাসহ। ছেলে যদি ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল করতে না পারে, তাহলে তাকে বলা উচিত, তুমি যেভাবে ড্রিবল (Dribble) করলে তা অসাধারণ ছিল। কালকে আর একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এভাবে তাদের ছোটখাট সাফল্যকে মূল্য না দিলে তাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ঘিরে আসবে। কোনো লক্ষ্যেই পৌছতে পারবে না ওরা। পায়ের নিচে জমি নড়বড়ে হয়ে যাবে।

- কিশোররা যেন বিশ্বাস করে যে, মাতা-পিতা তাদের বিপদের বান্ধব, সর্বোপরি সবসময়ের অকৃত্রিম রক্ষাকবচ।
- কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।
- শিশু-কিশোরদের প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর দেয়া উচিত। জার্মান শিক্ষাবিদ Friedrich Froebel (১৭৮২-১৮৫২) এর একটি উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, হে শিশুর পিতা, শিশুর প্রতি কঠোর হয়ো না। তার পুনঃপুনঃ প্রশ্নবাণে অস্থিরতা প্রকাশ করো না। প্রতিটি কঠোর শব্দের আঘাত তার জীবন ফুলের পাপড়ি নষ্ট করে দেয়। জীবন তরুণের শাখা বিনষ্ট করে ফেলে কিশোরদেরকে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বোঝাতে হবে। কথা অপেক্ষা ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করে বেশি। তারা অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং মাতা-পিতাকে তাদের সামনে মিথ্যাচার, ভণ্ডামী বা অনৈতিকতা আচরণ হতে বিরত থেকে নিজেদেরকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে হবে। মাতা-পিতা হবেন সন্তানের কাছে একজন সৎ ও সুন্দর মানুষের প্রোজ্জ্বল প্রতিভূ [১৬]।
- মাতা-পিতা দেখলেন তাদের কিশোর ছেলেটি খেলোয়াড় হতে চায়। কিংবা কিশোরী মেয়েটি হতে চায় বিমানের পাইলট যা মাতা-পিতার অপছন্দ। এক্ষেত্রে তাদেরকে ভর্ৎসনা করার আগে পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। তাই তাদের পছন্দের পেশার খোঁজখবর নিতে হবে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ জানতে হবে। মাতা-পিতার অপছন্দ হলো ওদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভালোভাবে বিচার করতে হবে। এখানে এটি বলা হচ্ছে না যে, কিশোর-কিশোরীর সব ইচ্ছেকে বিনা বাক্যে যাচাই বাছাই ছাড়াই মেনে নিতে হবে। যাচাই বাছাই অবশ্যই করতে হবে। তবে তাদের আবেগ-অনুভূতি-চিন্তা, রুচি ইত্যাদিকেও সহানুভূতির সাথে বিশ্লেষণ করে দেয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের ভূমিকা

কিশোর-কিশোরীরা দিনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয়ের রীতিনীতি, আচার-শৃঙ্খলা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস-কারিকুলাম ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি বিদ্যালয়ের রীতিনীতি-আচার শৃঙ্খলায় যদি সভ্যতা, ভব্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সমতা ইত্যাদিসহ নানামুখী সুসভ্য সংস্কৃতির নিয়ত চর্চা ও প্রাত্যহিক অনুশীলন ঘটে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সুতরাং শিক্ষক যদি চরিত্রবান না হন, সুন্দর স্বভাবের অধিকারী না হন, সমতা ও সমদর্শিতার গুণে গুণান্বিত হয়ে না উঠেন, সর্বোপরি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে একটি নির্মল আসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে নিছক পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জীবন গঠনের কোন দীক্ষা লাভ করতে পারবে না। সুতরাং, সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস-কারিকুলামকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিশু-কিশোরদের মাঝে একগুচ্ছ অভিন্ন নৈতিক মূল্যবান মূল্যবোধ তৈরীতে সহায়ক ও জীবনমুখী হয়।

স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

এখন যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করছে, তারা জন্মের পর বিছানায় থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনের আওয়াজ শুনে দুধ পান করছে। বাচ্চাকে খাওয়ানোর সুবিধার্থে মা তার সন্তানকে মোবাইলে কার্টুন দেখিয়ে খাওয়াচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে শিশুরা স্মার্ট ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ে। একটা পর্যায়ে তারা পুরোপুরিভাবে এটার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাত্র একযুগ পূর্বেও মোবাইল ফোনের ব্যবহার খুব কম ছিলো। এখন দেশের এক প্রান্তের সংবাদ থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই প্রযুক্তির ব্যবহার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজনের তাগিতে আমরা মোবাইল ব্যবহার না করে এখন চলতে পারছি না। খুব নিকটে রয়েছে কোন ব্যক্তি, তার কাছে হেঁটে গিয়ে বলা যায়। কিন্তু খুব সহজে মোবাইল ফোনে কথা বলেন। অনেকটা অলস প্রকৃতির মতো হয়ে গেছে মানবসমাজ। প্রশ্ন হলো কোন বয়সের লোক এসব মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই এর ব্যবহারের জন্য বয়সের সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কারণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সহজেই অশ্লিল ভিডিও ধারণ করা যায় এবং তা খুব সহজে সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। মোবাইল ফোনের মধ্যে আপত্তিকর ভিডিও যারা বেশী উপভোগ করছে তারা অধিকাংশই কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে। মোবাইল চালু করলেই নানা ধরণের টিকটক ভিডিও। এসব ভিডিও দেখে তারা ইভটিজিং, অপহরণ ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে খুব সহজে জড়িয়ে পড়ছে। প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়েও কিশোর-কিশোরীরা সকল গোপনীয়তা জেনে গেলে, তাদের আর কোন লজ্জাবোধ থাকে না। তারা বড়দের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই পিতামাতা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কিশোর অপরাধ কমাতে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। না হলে এর ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশমালা

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের দ্বারা এমন অপরাধ সংঘটিত হওয়া মোটেই কাম্য নয়। আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের ভূমিকাই পারে শিশু-কিশোরদের এমন হীন অপরাধ থেকে বিরত রাখতে। কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে আইনের সুষ্ঠু সংস্কার অতীব জরুরি। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম কেউ অপরাধ করলে তাকে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়। হত্যাকাণ্ডের মতো সর্বোচ্চ অপরাধের জন্য শাস্তি মাত্র ১০ বছরের কারাদণ্ড। শাস্তির মাত্রা লঘু হওয়ায় কিশোরেরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। শাস্তির সীমা বাড়াতে আইন বিভাগকে পদক্ষেপ নিতে বা অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় রেখে আইনের সংস্কার প্রয়োজন। পরিবার হচ্ছে একটি শিশুর শিক্ষার সূতিকাগার। পারিবারিক অনুশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও পরিবারের অভিভাবকদের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

১. কিশোর গ্যাংগুলো রাষ্ট্রের কাঠামোগত সন্ত্রাসের প্রতিবিম্ব। 'গ্যাং-কালচার' ভয়ের শাসনেরই প্রতিধ্বনি। তারা হয়ে ওঠে বড় মাফিয়াদের অনুকৃতি বা মিনিয়েচার। দমন ও সংশোধনের কাজ জারি থাকুক। কিন্তু এই গভীর সামাজিক ও প্রজন্মগত ব্যাধির নিরাময় পুলিশি পন্থায় হওয়ার নয়। পুলিশের কাজ লক্ষণ নিয়ে। সমস্যার উৎস নির্মূল সমাজ-রাষ্ট্র, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক-রাজনৈতিক নেতাদের কাজ। কিশোর গ্যাংয়ের বড়ভাইদের ক্ষমতার পাইপলাইন কাটা পড়লেই গ্যাংবাজির প্রতাপ তলানিতে নেমে আসবে। তাহলে এই কিশোরেরা সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলনে মতো হাজারো ভালো কাজের বাতিঘর হয়ে উঠবে।

২. আমাদের দেশে মাদকের সহজলভ্যতা কিশোর অপরাধের অণ্যতম প্রধান কারণ। মাদকের নেশায় ছোট ছোট অপরাধ করতে করতে একসময় সে দাগী আসামী হয়ে যায়। অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা দূর করতে হবে। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন হরতাল, পিকেটিং, বোমা বানানো, বোমা ছোড়া এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডে যেনো শিশুদের ব্যবহার করা না হয় সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এর সাথে যুক্ত থাকতে থাকতে কিশোররা এক সময় পুরোপুরি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে কিশোরদেরকে মুক্ত রাখতে হবে।

৩. গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে বেশীরভাগ শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিনোদন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। হারিয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ। কিশোররা এখন টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইলফোন, ফেসবুক, টিকটক, আড্ডাবাজিতেই ব্যস্ত থাকে। তাদের সঠিক মানসিক বিকাশের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিশু কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা রোধে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। পারিবারিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। পারিবারিক পরিবেশ গঠনমূলক রাখতে হবে। হিংসা ও কলহমুক্ত হতে হবে পরিবার। পরিবারের সকল সদস্যদের একে অপরকে শ্রদ্ধা,সম্মান ও স্নেহ করতে হবে। তবেই সে পরিবারে শিশুরা নিরাপদবোধ করবে। এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার আরও যত্নবান হতে হবে। অসৎ সঙ্গ থেকে সন্তানকে দূরে রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব। সে কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, কি করছে এ সব বিষয়ে সবসময় অভিভাবককে সচেতন হতে হবে।

৫. শিশুদের খারাপ সঙ্গ ও অসামাজিক লোকদের থেকে দূরে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশের মান উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সমাজে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। রয়েছে কিছু আইন। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ হচ্ছেনা। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। থানায় পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা কররার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। তবে নির্যাতনের ফলে শিশুদের ওপর যে প্রভাব পড়ে সে বিষয়ে পুলিশদের বুঝানো যেতে পারে যেনো তারা নিশ্চিত না হয়ে কোন শিশুর ওপর নির্যাতন না করে। সবচেয়ে ভালো হবে একটি সতর্কদৃষ্টি সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের ও পুলিশের সমন্বয়ে একটি মানবিকীকরণ প্রচারণা চলানো। যেহেতু

কারাগারে শিশুর সংখ্যা কম সেহেতু তাদের সুযোগ সুবিধা ভালোভাবে দেখে এবং তাদেরকে যেনো যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করা হয় তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেননা শিশুদের ক্ষেত্রে এসব কিছু হচ্ছে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব।

৭. সরকারি কর্মকর্তা, স্বনামধন্য ব্যক্তি, গণমাধ্যম, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও শিশুদের সমন্বয়ে কারগার ও সংশোধনী কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের সমন্বয়ে একটি 'রিভিউ কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। এরা কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ে মাসে একবার সভা করবেন। এতে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। শিশু অধিকার সনদ, কিশোর বিচার ব্যবস্থা এবং আনুষাঙ্গিক আইনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে পুলিশ, বিচারক এবং সংশোধন কেন্দ্রে কর্মকর্তাদের ধারণা দেওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করতে হবে।

৮. শুধু দোষী সাব্যস্ত হলেই নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কিশোর ছেলেরা আইনের সংস্পর্শে আসে। এটা আরও বেশি সত্য হয়ে ওঠে যদি তারা পথশিশু হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের প্রথম যোগাযোগ ঘটে। এরপর তারা একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয়, যার ফলে তাদেরকে লক-আপ আটকে থাকতে, কোর্টে শুনানি ও বিচারের জন্য হাজিরা দিতে অথবা বাংলাদেশের কোন এক সংশোধনী প্রতিষ্ঠান, ভবঘুরে কেন্দ্র বা জেলে দীর্ঘকালের জন্য আটক থাকতে হতে পারে। সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সচেতন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইন ব্যবস্থার অধীন ছেলেরা যে ধরনের কিশোর বিচার ব্যবস্থা পায় তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মাপকাটি লঙ্ঘন করে। ছেলেরা অনেক সময় অযৌক্তিক কারণে গ্রেপ্তার হয় এবং মামলার আগে ও পরে গতানুগতিক ভিত্তিতে আটক থাকে। বিভিন্ন কারণে তারা ন্যায্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং আটক থাকাকালে তাদের খাবার, গোসল, মল-মূত্র ত্যাগ, ঘুমানো ও চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। পুলিশ ও তারা যে প্রতিষ্ঠানে থাকে সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দা ও কর্মীদের দ্বারাও তারা নির্যাতিত হয়। দক্ষ প্রশিক্ষণের অভাবেই সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা ভবঘুরে আবাস তাদের ঘোষিত পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয় না। অতএব এ ব্যাপারে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. প্রত্যেক বন্দীর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে সংশোধন পদ্ধতি নির্ণয় (ডায়াগনেসিস) অত্যাবশ্যক। সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমূহের ডায়াগনোসিসের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এরূপ একটি সংশোধন কর্মসূচীতে মনস্তাত্বিক, মনোচিকিৎসাভিত্তিক ও সমাজবিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের শ্রেণিভূক্ত করার উপযোগী আধুনিক কৌশলযুক্ত করতে হবে। একজন মনস্তত্ববিধ, একজন মনোচিকিৎসক এবং টেকনিক্যাল ও মেডিকেল কর্মচারী নিয়ে একটি "শ্রেণীভূক্তকরণ বোর্ড" গঠন করা যেতে পারে। লিঙ্গ, কয়েদ কাল, শাস্তির ধরন, অপরাধ প্রবণতার মাত্রা এবং শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য অনুযায়ী অপরাধীদের শ্রেণীভূক্ত করতে হবে।

১০. কিশোরদের লেখাপড়ার জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১১. কিশোর অপরাধ, কিশোরদের সংশোধণ, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে জনগন তেমন সচেতন নয়। কিশোর অপরাধ রোধের জন্য সংশোধনের চেয়ে পরিবার ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি অধিক প্রয়োজন। এজন্য এ ব্যাপারে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

শিশুরা দেশ ও জাতির আগামী দিনের দর্পণ ও আলোকবর্তিকা। তাদের উপর নির্ভর করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ও মানবকল্যাণ চিন্তা চেতনায় শিশু কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধজগতের করাল গ্রাস হতে রক্ষায় মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার বিষয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি যে প্রয়াস, আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্য তা একটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক ও সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত কিশোরদের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে না পারলে এবং তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম চরম হুমকি ও সংকটের মুখে পতিত হবে। একারণে কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে পারিবারিক প্রাথমিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর শারিরীক ও মানসিক বিকাশ সাধন অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে। তাছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বোধ শক্তি জাগ্রত করতে হবে। যদি শিশুদের সমন্বিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়। তাহলে তারাই একদিন সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দায়িত্বগ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নানা কারণে এদের একটি অংশ আজ বিপথগামী। যদি এদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা না যায় তাহলে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবে। তাই সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও সমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিবর্গকে এদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। যেন, আর কোন শিশু-কিশোর তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়। পাশাপাশি সরকারকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে, কিশোর অপরাধ দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিশু কিশোরদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে এবং অনুকরণীয় সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে সকল পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র উপদেষ্টা এবং মনোবিজ্ঞানী নিয়োগদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যারা কাউন্সিলিং -এ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়াও এক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ অত্যন্ত যত্নশীল হয়ে কিশোরদেরকে সুশিক্ষায় বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পরিবার ও বিদ্যালয়ে অন্তরঙ্গ সৌহার্দপূর্ণ সর্ম্পক সৃষ্টি করতে হবে। শিশু কিশোরদের সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা করে আমাদের তৈরী করতে হবে। শিশুরা যেন সব রকম সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই একটি শিশু অপরাধী না হয়ে সমাজের একজন দায়িত্বান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিশুদের সর্বদা পড়ালেখা, খেলাধুলা, লাইব্রেরী, শরীর চর্চা, স্কাউটিং, সৃজনশীল গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। এলাকা ভিত্তিক বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাড়াতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

১. Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud. McGraw-Hill Text. pp.105-107

২. Burt, C.L. (1923). The Causal Factors of Juvenile Crime. British Journal of Medical Psychology.

৩. U.S. Children's Bureau, Juvenile Court Statistics, 1954, Children's Bureau Statistical Series No. 31, 1956, p. 11.

৪. Russell, Bertrand (1921). The Analysis of Mind. London: George Allen & Unwin

৫. Greenberg, David F (1997). Crime And Capitalism: Readings in Marxist Crimonology, Temple University Press.

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯): গল্পগুচ্ছ, পৃষ্ঠা ৬৫

৭. John Reinemann, "Probation and the Ju venile Delinquent," The Problem of Juvenile Delinquency, ed. Sheldon Glueck (Cambridge: Riverside Press, 1959), p. 615.

৮. Tappan, Paul W (1949). Juvenile Delinquency. McGraw-Hill Text.

৯. সানোয়ার হোসেন (২০২৩) : কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার রোধ জরুরি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুলাই https://www.ittefaq.com.bd/651243

১০. মেহেদী হাসান খাজা (২০২৩), রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় 'ভয়ংকর' কিশোর গ্যাং, ঢাকা প্রকাশ, ০৩ জানুয়ারি, https://www.dhakaprokash24.com/special-report/news/40830

১১. রাকিব হোসেন (২০২১) : রাজনৈতিক মদদে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধ বাড়ছে কামরাঙ্গীরচরে, https://www.dailynayadiganta.com/city/557037

১২. Nisar, M., Ullah, S., Ali, M., &Alam, S. (2015). Juvenile delinquency: The Influence of Family, Peer and Economic Factors on Juvenile Delinquents. Applied Science Reports, 9(1), 37-48.

১৩. Nourollah, M., Fatemeh, M., &Farhad, J. (2015). A study of Factors Affecting Juvenile Delinquency. Biomedical and Pharmacology Journal.

১৪. Poduthase, H. (2012). Parent-Adolescent Relationship and Juvenile Delinquency in Kerala, India: A Qualitative Study (Doctoral Dissertation, College of Social Work, University of Utah).

১৫. খান, আরিফ (২০২১), বাংলাদেশের সংবিধান, বিএলবি, পৃষ্ঠা ৯৭

১৬. Froebel, Friedrich (1826). The Education of Man. Dover Publication